জিহাদ কী আত্মরক্ষামূলক না প্রতিরক্ষামূলক

একটি পত্র এবং তার উত্তর

পত্রের ভাষ্য

মুহতারাম জনাব মাওলানা তকী উসমানী সাহেব (দা. বা.)

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

আপনার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'আল-বালাগ' এই অধমের (প্রেরক) পড়ার সুযোগ হয়েছিল। ১৩৯১ হিজরীর মুহররম (মোতাবেক ১৯৭১-এর মার্চ)-এর সংখ্যার ১০ পৃষ্ঠায় ১৭ ও ১৮ ধারায় এই ভাষ্য পেলাম।

(১৭) 'অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে সব রাষ্ট্র ইসলাম এবং মুসলমানদের শত্রু নয়, তাদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বা মেলামেশা এবং ভালো ব্যবহারের সম্পর্ক বিদ্যমান রাখা যাবে।'

(১৮) 'অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃত চুক্তি যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয, তা অনুসরণ করা হবে। আর অন্য অবস্থায় (শরয়ীভাবে জায়েয না হলে) কৃত চুক্তি বা সন্ধির সমাপ্তির ঘোষণা করা হবে।'

আইনের এই ধারার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, অমুসলিম রাষ্ট্র যদি শত্রু শক্তি না হয়ে বরং বন্ধুভাবাপন্ন হয়, ইসলামী রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে অমুসলিমদেরকে তাদের স্বধর্মের ওপর ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য হওয়া সত্তেও সেখানে ইসলামী হুকুমত বাস্তবায়নের জন্য জিহাদ করবে না। যদিও আমার মতে সে অবস্থাতেও নিরবচ্ছিন্নভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রাখা যাবে।

সারকথা: আইনের এই দুই ধারার সঙ্গে অধম সম্পূর্ণ একমত। কেননা অধমের চিন্তাধারা এই যে, মুসলমানদের মৌলিক কাজ হল সারা দুনিয়ায় ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ অব্যাহত রাখা, কর্তৃত্ব বা শক্তি প্রদর্শন করা ইসলামের মূখ্য উদ্দেশ্য নয়; কিংবা কাফেরদেরকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে জোর-জবরদস্তি উচ্ছেদ করে সব জায়গায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করাও উদ্দেশ্য নয়। (যা মাওলানা মওদুদী সাহেবের চিন্তাধারা।) অবশ্য অমুসলিম রাষ্ট্রের শত্রু শক্তি এবং অকল্যাণ কামনাকারীদের কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে

নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে নিজেদের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনে শক্তি বা কর্তৃত্ব অর্জনের চেষ্টা (অর্থাৎ আক্রমনাত্মক জিহাদ) করা উচিত।

কিন্তু (আল-বালাগের) ১৩৯১ হিজরীর রবিউসসানী (মোতাবেক ১৯৭১ খ্রি: জুন মাস সংখ্যায় مختصر سيرة نبويه-এর কিতাব প্রণেতা মাওলানা আব্দুশ শাকুর সাহেব লাখনভী-এর ওপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে ৭১তম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বক্তব্য হল :

'জিহাদের বৈধতা বা শরয়ীভাবে অনুমোদন শুধুমাত্র নির্যাতিত মজলুমদের জন্য; আর জুলুম-নিপীড়নকে প্রতিরোধ করার জন্য। ভিন্ন শব্দে জিহাদ হল নিজের স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করা। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের জিহাদসমূহকে শুধুমাত্র প্রতিরোধক এবং আত্মরক্ষামূলক বলে মনে না করা, ধর্মহীনতাই নয় বরং এটি অজ্ঞতারও পরিচয় বৈকি?'

মাওলানা আবদুশ শাকুরের উল্লিখিত কিতাবের উদ্ধৃতি টেনে আপনি আরো লিখেছেন :

'শুধুমাত্র দেফায়ী জিহাদ তথা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ জায়েয। জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হল, إعلاء كلمة الله 'আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা।' যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার করা এবং কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমনাত্মক জিহাদ শুধু জায়েই নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষ তা ওয়াজিবও হয়ে যায় এবং এটি প্রতিদান ও সওয়াবের কারণও বটে। কুরআন হাদীস ছাড়া সমগ্র ইসলামী ইতিহাসে এজাতীয় জিহাদের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অমুসলিম সম্প্রদায়ের সমালোচনায় প্রভাবিত হয়ে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা অথবা এগুলোকে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। নিঃসন্দেহে কোনো এক ব্যক্তিকেও শক্তির জোরে মুসলমান বানানো হয়নি এবং ইসলামে তার অনুমতিও নেই। নতুবা [جزية] ট্যাক্স-এর দপ্তর প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পরিপূর্ণ অনর্থক হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার বা কায়েম করার লক্ষ্যে অসি বা তলোয়ার চালনার বিধান করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি কুফুরীর ওপর অটল থাকতে চাইলে সে থাকবে। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্ট এই দুনিয়ায় একমাত্র তারই হুকুম চলবে। আর মুসলমান আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে এবং সীমালংঘনকারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়ার জন্যে জিহাদ করে থাকে। আমরা এই বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে যেয়ে ওইসব লোকদের সামনে কেন লজ্জিত হব? যাদের পুরো ইতিহাস রাষ্ট্র দখলে রক্তপাত

ঘটানোর ইতিহাস। যারা শুধুমাত্র নিজেদের মনোবৃত্তির জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য কোটি কোটি মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিতে কার্পণ্য করেনি।'

এই পর্যালোচনা সম্পর্কে আমি আপনার কাছে দু'টো আর্জি পেশ করছি।

প্রথমত : মাওলানা আব্দুস শাকুর সাহেব লাখনভীর নির্বাচিত এই বাক্যমালা দ্বারা বোঝা যায় যে, তার দৃষ্টিতে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ জায়েয। আর এই অধমের দৃষ্টিতে তার অভিমতটি সহীহ নয়। তিনি একথাও বলেন যে, জিহাদ নাম হল নিজের হেফাজত করা। যার অধীনে আক্রমনাত্মক জিহাদও আসতে পারে। যেমন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন :

'ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং নিজস্ব স্বাধীনতাকে হেফাজতের জন্যই জিহাদ। এর দ্বারা একথা বোঝা যায় না যে, জিহাদের সূচনা করা যাবে না। আর সূচনা করার উদ্দেশ্যটাও তো প্রতিরোধমূলক। কেননা প্রাধান্য বিস্তার ছাড়া ওইসব কাজ আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারে। এই বাধা-বিপত্তিকে প্রতিহত করার জন্য জিহাদের হুকুম দেয়া হয়ে থাকে।' [মালফুজ-৪৯৭, আল-ইজাফাতুল ইয়াওমিয়্যাহ: খণ্ড-৬]

নিশ্চয়ই মাওলানা আব্দুশ শাকুর সাহেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক আক্রমনাত্মক জিহাদ সম্পর্কে অবগত থাকবেন। সুতরাং তিনি আক্রমনাত্মক জিহাদকে নাজায়েয বলতে পারেন না। অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব জিহাদকে প্রতিরক্ষামূলক বলেন, যা সহীহ। কেননা এসব জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং নিজস্ব স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের জন্য আরবের কাফেরদের শক্তি সামর্থকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া। যাতে করে সত্য দ্বীনের প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জিত হয়। আর যখন এই উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে গেল তখন বিদায় হজের সময় আল্লাহ তাআলা সূরা মায়িদার তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ করেন:

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون أليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.

'আজ কাফেররা (পরাজিত ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায়) তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না। (যে তারা তোমাদের দ্বীনকে মিটিয়ে দেবে) আর শুধু আমাকে ভয় কর। (অর্থাৎ আমার বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করো না।) আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন

পূর্ণাঙ্গ করলাম (সর্ব বিষয়ে) (শক্তির মাধ্যমেও যার ফলে কাফেররা নিরাশ হবে। এবং বিধি-বিধান এবং নিয়মনীতির মাধ্যমেও)। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (দ্বীনী বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গ হয়েছে এবং দুনিয়ারও যে শক্তি-সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে এবং দ্বীনের পরিপূর্ণতার মধ্যে উভয়টি এসে গেছে।)'

মূলত: মাওলানা আবদুশ শাকুর সাহেবও 'স্বীয় স্বাধীনতার সংরক্ষণ'-এর অধীনে প্রতিরক্ষামূলক এবং আক্রমনাত্মক উভয় প্রকারের জিহাদকে তার ভাষ্যে উদ্দেশ্য করে নিয়েছেন। অতএব, আমরা যদি এখন ওইসব বিষয় বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেই, তাহলে বেশ ভালো হবে এবং পাঠক কোনো ধরনের ভ্রমে থাকবে না।

দ্বিতীয় কথা আল-বালাগে প্রকাশিত আপনার পর্যালোচনামূলক বক্তব্যের ওপর পর্যালোচনা এখানে এই উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে, যাতে করে আপনি আপনার চিন্তাধারা ও উদ্দেশ্যের সত্যায়ন বা প্রত্যাখ্যান ব্যক্ত করে দেবেন। (প্রত্যাখ্যান অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর (হাদিসের) দলীলাদিও পেশ করে দেবেন বলে প্রত্যাশা করছি)। নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা আমার ওইসব চিন্তাধারা আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

আপনি আক্রমনাত্মক জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যক্ত করেছেন إعلاء كلمة الله অর্থাৎ 'আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করা।' আপনার বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে ইসলামের বিজয় এবং তার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করা এবং কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া। যাতে করে স্রষ্টার সৃষ্ট দুনিয়াতে তারই বিধিবিধান চলে।

এই উদ্দেশ্য বা মূলকথা বোঝার জন্য প্রথমত: আমাদেরকে إعلاء كلمة الله-এর অর্থ এবং তার অন্তর্নিহিত মর্ম নির্দিষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন। অধমের কাছে প্রত্যেক যুক্তিসঙ্গত, সত্য-সহীহ বা বিশুদ্ধ এবং ন্যায়নীতির কথাকেই كلمة الله বা كلمة الحق বলে। সুতরাং আল্লাহর কালিমাকে প্রত্যেক যুক্তি বিবর্জিত, ভ্রান্ত, ভুল, ন্যায়নীতি পরিপন্থি কথাবার্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ মানুষের অন্তরে كلمة الله অথবা كلمة الحق সম্পর্কে দৃঢ়তা সৃষ্টি করা এবং তার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা। সেইসঙ্গে প্রথমোক্ত বিষয়গুলোর মর্যাদা ও সৌন্দর্য্যের বিশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। আর কোনো বস্তুর বিজয় ও সফলতার উদ্দেশ্য হল অধিকাংশের অন্তরে সে জিনিসটিকে স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেয়া।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অজ্ঞতা বিস্তারের উদ্দেশ্য হল, অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান থেকে অজ্ঞ বা মূর্খ থাকা। দুনিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারের অর্থ হল অধিকাংশ লোক দুনিয়ার ভালোবাসায় মত্ত হয়ে যাওয়া এবং হালাল হারামের প্রতি কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করা। পশ্চিমাদের প্রাধ্যন্য বিস্তারের দ্বারা উদ্দেশ্য হল অধিকাংশ লোক পশ্চিমাদের কৃষ্টি-কালচার এবং চাল-চলন বা স্টাইলকে গ্রহণ করা। হানাফীয়াতের প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বেশীরভাগ মানুষ হানাফী মাযহাব অনুসারী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। সুতরাং ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রকৃত অর্থে অধিকাংশ লোক ইসলামের অনুসরণকারী হয়ে যাওয়া। মূলত: এক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা 'ইসলামের দ্বীনি বিজয়'ই উদ্দেশ্য। যদি إعلاء كلمة الله-এর অর্থ 'ইসলাম'-এর প্রাধান্য বিস্তার হয়, তাহলে তা অর্জনের তরীকা একমাত্র একনিষ্ঠভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যাওয়া; সেইসঙ্গে মুবাল্লিগীন এবং মুসলমানদের বাস্তবতার নিরিখে যাবতীয় কার্যক্রম আঞ্জাম দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করা। এর দ্বারাই অমুসলিমদের অন্তরে এবং মন-মানসিকতায় পরিবর্তনের আবহ সৃষ্টি হতে পারে। তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের নিরেট প্রজা বানানোর দ্বারা এই উদ্দেশ্য কখনো সাধিত হবে না। কেননা এহেন অবস্থায় তারা পরাজয়ের গ্লানিতে ভুগবে। যা কান পেতে দাওয়াত ও তাবলীগের মর্মবাণী শোনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। সুতরাং আক্রমনাত্মক জিহাদ দ্বারা ইসলামের দ্বীনী প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে না; বরং মুসলমানদের রাজনৈতিক জয় হয় এবং এরই (রাজনৈতিক) প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েমের দ্বারা ইসলামের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি তো হল, মুসলমানরা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপূর্ণ অনুসারী হবে।

এছাড়া রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তাদেরকে সাচ্চা মুসলমান হওয়াও জরুরী নয়। রাজনৈতিক বিজয়ের দ্বারা তো এই উদ্দেশ্যও অর্জিত হয় না যে, খোদার সৃষ্ট পৃথিবীতে তার বিধিবিধান চলবে। কেননা, অমুসলিমরা তো ট্যাক্স [جزية] প্রদান করে, অনেকাংশই নিজেদের প্রচলিত রীতিনীতি বা জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করে, মদ ও শূকর তাদের ওপর হারাম হয় না, ব্যভিচার করার দ্বারা তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হয় না, তাদের সামাজিক, পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত নিয়ম-কানূন যথারীতি বাস্তবায়িত হতে থাকবে। তাদের মুর্তিপূজা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই চলতে থাকবে। আর একথাও বাস্তব যে, যদি কোনো কারণবশত: অমুসলিম প্রজাদের অধিকাংশ লোক ঈমান গ্রহণ না করে, তাহলে শুধুমাত্র এই রাজনৈতিক প্রাধান্য ও প্রভাব ওই সময় পর্যন্ত অটুট থাকবে যতদিন পর্যন্ত ইসলামী হুকুমত শক্তিশালী থাকবে। নুতবা ইসলামী হুকুমত দুর্বল

হয়ে পড়লে অমুসলিম প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং নিজেদের অতীত অপমানের তুলনায় অধিক বদলা নেবে। যেমনটি স্পেনে ইসলামী হুকুমতের অপমৃত্যুর পর হয়েছিল এবং উপমহাদেশেও যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

আমার উদ্দেশ্য আদৌ এমনটি নয় যে, আক্রমনাত্মক জিহাদ কখনো করা যাবে না; বরং শত্রু ও উচ্ছৃঙ্খল অমুসলিম রাষ্ট্রের ওপর যেমনটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, সক্ষম অবস্থায় আক্রমনাত্মক জিহাদ ওয়াজিব। (বরং আরো বেশকিছু অবস্থায় ওয়াজিব, যার আলোচনার স্থান এটি নয়)। যাতে করে তাদের শক্তি ভেঙ্গে যায় এবং ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে। অবশ্য অন্যান্য মিত্র এবং হিতাকাঙ্খী অমুসলিম রাষ্ট্র যারা নিজেদের এলাকায় দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক জিহাদ সমীচীন নয়। কেননা বিশ্ব সম্প্রদায় বর্তমানে গ্লোবালাইজেশনের বিষয়টিকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এর সম্পূর্ণ বিপরীত তৎকালীন যুগের বিষয়টি, যখন বিজয় এক সাধারণ বিষয় ছিল। আর বিজয় বাদশাহদের সৌন্দর্য বা শ্রেষ্ঠকর্ম হিসেবে পরিগণিত হত। এজাতীয় আক্রমনাত্মক জিহাদসমূহের ঘটনাবলীর দ্বারা ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ। এসব-ই সেই পূর্ববর্তী যুগের কথা। অবশ্য মুসলমানদেরকে নিজেদের সৈন্য সামন্তের শক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়িয়ে রাখা সমীচীন। যাতে অমুসলিম রাষ্ট্র যুদ্ধের কিনারায় ঘেঁষা তো দূরের কথা জিহাদের ভয়েই প্রভাবিত থাকে।

সমরাস্ত্র এবং শক্তি প্রস্তুত রাখা কুরআনের আদেশ। প্রাচীনকালে বিজয়ের ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রাথমিক বিজয়গুলো ছিল অন্যান্য সম্প্রদায়দের বিজয় থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। অন্যান্য (বিধর্মী) লোকদের বিজয় শুধুমাত্র নিজেদের শক্তির মহড়া প্রদর্শন এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশ করার লক্ষ্যেই ছিল। ইতিপূর্বে আপনার দেয়া ভাষ্য অনুযায়ী নিজের প্রবৃত্তিকে জাহান্নামে পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যেই এসব কর্মকাণ্ড ছিল। তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিপ্রায় রাজ্য বিস্তার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অথচ মুসলমানদের (জাজিরাতুল আরব, ইরান, রোমের জিহাদ ছাড়া আর তখন এসব রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নেয়া ছিল মুসলমানদের অত্যন্ত জরুরী) নিজেদের প্রাথমিক বিজয়ে রাজ্য বিস্তারের কোনো ইচ্ছাই ছিল না; বরং তাদের দৃষ্টির চূড়ায় ছিল দাওয়াত ইসলামের তাবলীগ। (যার সবচেয়ে উত্তম ও নিরাপদ পন্থা ছিল সে সময় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিস্তার।) যেমনটি হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যেব (রহ.) বলেন, 'সাহাবায়ে কিরাম বাহ্যিকভাবে তো যুদ্ধ-বিগ্রহ করতেন। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল [اعلاء كلمة الله] 'আল্লাহর কালিমাকে

সমুন্নত করা'। তাদের অভিপ্রায় যদি রাজ্য বিস্তারই হত, তাহলে নিশ্চয়ই তারা এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করতেন না যে, তোমরা নিজেদের রাজ্য নিয়ন্ত্রণাধীন রাখ। আমাদেরকে শুধু এতটুকু অনুমতি দাও যে, আমরা স্বাভাবিক গতিতে ইসলামের তাবলীগ করে যেতে পারি। আমরা লোকদেরকে জবরদস্তি ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করব না, তারা ইচ্ছা করলে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে গ্রহণ নাও করতে পারে। যারা এই চুক্তি মেনে নেবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। যদি রাজ্য দখলই উদ্দেশ্য হত তাহলে এই চুক্তির কোনো প্রয়োজন হত না; বরং তাদের রাজ্য দখল করে নিত। মোটকথা, অন্যান্য সম্প্রদায় চুক্তিবদ্ধ অথবা জিম্মী হিসেবে থাকতে সম্মত হলে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হত। কেননা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল اعلاء كلمة الله 'আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করা।' আর এটিই হল দাওয়াত ও তাবলীগের চূড়ান্ত পর্যায়।' [কারী মুহাম্মদ তৈয়্যেব সাহেব (রহ.) আওর উনকী মাজালিস: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৭-২৩৮]

অধম নিজের (এই পত্রের মাধ্যমে) বিশুদ্ধ চিন্তাধারার রংকে চিত্রায়িত করার প্রয়াস পেয়েছে। যাতে করে জনাবের পক্ষ থেকে জবাব দেয়া সহজ হয়। আশা করি ভালো আছেন। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত নিবেদক
সায়্যিদ বদরুল ইসলাম
জেদ্দা

আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.)-এর পক্ষ থেকে জবাব

মুহতারাম,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু!

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি জিহাদ সম্পর্কে যে বিবরণ তুলে ধরেছেন, আমি তার সারকথা এমনটি বুঝেছি যে, যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র নিজের রাষ্ট্রে মুসলমানদেরকে তাবলীগের অনুমতি দেয়, তাহলে এরপর আর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েয হবে না। যদি এমনটিই আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অধম এই মতের সঙ্গে একমত হতে পারছে না। 'ইসলামের প্রচার-প্রসারের পথে অন্তরায়' শুধু এটুকুই নয় যে, অমুসলিম রাষ্ট্র তাবলীগের ওপর আইনী প্রতিবন্ধকতা আরোপ করবে; বরং কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে সীমাহীন প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়া বাস্তবেই দ্বীনে হক-এর তাবলীগের

রাস্তায় অনেক বড় বাধা। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে তাবলীগের ওপর কোনো আইনী প্রতিবন্ধকতা নেই; কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে এদের বিস্তর প্রভাব এবং ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য এই প্রভাব এবং ঐশ্বর্যের কারণে বিশ্বব্যাপী এমন মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গেছে, যা মানবচজাতিকে সত্যধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে তাবলীগের ওপর আইনী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেয়ে অনেক বড় অন্তরায়।

সুতরাং কাফেরদের এই প্রভাবকে তছনছ করে দেয়া জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। যাতে এই প্রভাব-প্রতিপত্তির ওপর ভিত্তি করে মানুষের মাঝে যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে তা বিদুরিত হয়ে সত্য গ্রহণের রাস্তা সহজ হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং প্রাধান্য বজায় থাকবে, মানুষের অন্তর এর দ্বারা প্রভাবিত হতেই থাকবে। সাধারণ মানুষ সত্যদ্বীন গ্রহণ করার জন্য পরিপূর্ণভাবে উৎসাহবোধ করবে না। সুতরাং জিহাদ অব্যাহত থাকবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না ও পরকালেও বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্যদ্বীন গ্রহণ করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে ট্যাক্স [جزية] দেয়।' [সূরা তাওবা : আয়াত-২৯]

এই আয়াতে জিহাদ ওই সময় পর্যন্ত চালু রাখতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেররা নত হয়ে ট্যাক্স [جزية] আদায় না করবে। যদি জিহাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাবলীগের আইনগত স্বাধীনতা অর্জন করাই হয়, তাহলে একথা বলা হত 'যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাবলীগের অনুমতি না দেয়'। কিন্তু ট্যাক্স [جزيــة] ওয়াজিব করা এবং তাদের লাঞ্ছিত, অপমাণিত হওয়ার এই কথার সুস্পষ্ট দলীল যে, মূল উদ্দেশ্য হল তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে নষ্ট করে দেয়া এবং কুফুরীর রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা দিল-দেমাগে প্রভাবের যে পর্দা পড়ে যায় তা অপসারিত হওয়া। তারপরই মুক্ত মনে ইসলামের সৌন্দর্যের ওপর মানুষের চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

তাফসীরে কাবীরে ইমাম রাযী (রহ.) এই আয়াতের অধীনে এই ব্যাখ্যা করেছেন :

ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره على الكفر، بل المقصود منها حقن دمه، وإمهاله مدة، رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الإسلام، وقوة دلائله، فينتقل من الكفر إلى الإيمان .... فإذا امهل الكافر مدة، وهو يشاهد عز الإسلام، ويسمع دلائل صحته، ويشاهد الذل والصغار في الكفر. فالظاهر أنه يحمله ذالك على الإنتقال إلى الإسلام، فهذا المقصود من شرع الجزية.

'কর [جزية] নির্ধারণ দ্বারা কাফেরদের কুফুরীর ওপর অটল রাখা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হল সেখান থেকে রক্তপাত বন্ধ করে দেয়া। আর কিছু সময় অবকাশ দেয়া এই আশায় যে, সম্ভবত সে এক সময় ইসলামের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব বলিষ্ঠভাবে জানতে সচেষ্ট হবে। এরপর কুফুরী থেকে ঈমানের দিকে ফিরে আসবে। যদি কাফেরদের কিছু সময় অবকাশ দেয়া হয়, তাহলে তারা ইসলামের মর্যাদা অবলোকন করবে, ইসলামের দলীলাদির সত্যতা জানতে পারবে এবং কুফুরীর ক্ষেত্রে নিচুতা বা হীনতা দেখতে পাবে; এতে করে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে এই সব বিষয় ইসলামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। মূলত: এটিই ট্যাক্স [جزية] আদায় করার মূখ্য উদ্দেশ্য।' [তাফসীরে কাবীর: খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬২]

আরেকটি চিন্তার বিষয় হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের যুগে কি কোথাও এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কিরাম অন্য রাষ্ট্রের ওপর হামলা করার পূর্বে দাওয়াতী মিশন পাঠিয়ে অপেক্ষা করেছেন যে, তারা দাওয়াাতের কাজের অনুমতি দেয় কি না এবং শুধু তাবলীগী কার্যক্রমের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেই জিহাদ করা হয়েছে কি না?

রোমে আক্রমণের পূর্বে কি কোনো দল প্রেরণ করা হয়েছিল? ইরানে আক্রমণের পূর্বে কি একথার চেষ্টা হয়েছে যে, যদি জিহাদ ছাড়া শুধু তাবলীগ দ্বারাই কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, তো উত্তম। নি:সন্দেহে এমনটি করা হয়নি। পরিণামে প্রতিভাত হয় যে, শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভই উদ্দেশ্য ছিল না। যদি শুধু এতটুকুই উদ্দেশ্য হত তাহলে একটি সন্ধি করে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়ানো যেত। অথচ আমার জানা মতে, ইসলামের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যাবে না, যেখানে শুধু তাবলীগী কার্যক্রমের অনুমতির শর্তে যুদ্ধ বন্ধ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এর বিপরীত কাদেসিয়ায় মুসলমানগণ তাদের যে উদ্দেশ্যের বিবরণ দিয়েছেন তা হল:

وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله.

'মানবজাতিকে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসা।' [কামিল ইবনে আসীর: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৮]

এমনিভাবে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله.

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেৎনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।' [সূরা আনফাল: আয়াত-৩৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) লেখেন :

'দ্বীনের অর্থ প্রবল ও বিজয়। তখন আয়াতের ব্যাখ্যা দাঁড়াবে মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না মুসলমান তাদের নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে সেইসঙ্গে অন্যের জুলুম থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার মত দ্বীন-ইসলাম প্রবল না হবে।'

আরো একটু আগে বেড়ে তিনি লেখেন : 'এই তাফসীরের সারসংক্ষেপ হল, মুসলমানদের ওপর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব, যতক্ষণ না তাদের নির্যাতনের অবসান হবে এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলাম প্রবল হবে। আর এই অবস্থা কেবলমাত্র কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তেই হবে। এই জন্যই জিহাদের হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।' [মাআরিফুল কুরআন: খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩৩]

সারকথা হল আমার মতে জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু দাওয়াতী কার্যক্রমের স্বাধীনতা অর্জন নয়; বরং একদিকে কাফেরদের শান-শওকত গুঁড়িয়ে দিয়ে মুসলমানদের শান-শওকত প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে করে মুসলমানদের প্রতি কেউ বাঁকা দৃষ্টিতে তাঁকানোর সুযোগ না পায়। অপরদিকে কাফেরদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ তাদের ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে খোলা মনে ইসলামের সৌন্দর্য বোঝার প্রতি উৎসাহিত হতে পারে। আর মৌলিকভাবে এতে ইসলামের সংরক্ষণই উদ্দেশ্য। এ জন্যে কোনো কোনো আলেম জিহাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন হেফাজতে ইসলাম দিয়ে। তবে কাফেরদের ক্ষমতা চূর্ণ করে মুসলমানদের শান-শওকত প্রতিষ্ঠিত করা হেফাজতে ইসলাম বা ইসলাম সংরক্ষণের মৌলিক উপাদান। তাই এই মৌলিক উপাদানকে তা থেকে বের করা যাবে না। আমার মতে শীর্ষস্থানীয় সব আলেম জিহাদের উদ্দেশ্য একেই সাব্যস্ত করেছেন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলভী (রহ.) বলেন : 'জিহাদের হুকুম দ্বারা কাফেরদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়া আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য নয়;

বরং উদ্দেশ্য হল, যেন আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং মুসলমান স্বসম্মানে জীবনযাপন করতে পারে, নিরাপত্তার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারে এবং কাফেরদের থেকে ধর্ম পালনে বাধা সৃষ্টির আশংকা না থাকে। আর ইসলাম তার শত্রুদের অস্তিত্বের দুশমন নয়; বরং তাদের এমন শান ও শওকতের দুশমন, যা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য আশংকাজনক।' [সীরাতে মুস্তফা: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮৮]

অন্য এক জায়গায় তিনি লেখেন : আল্লাহর বাণী :

وقاتلوهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله

এর মধ্যে ওই ধরনের জিহাদই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ 'হে মুসলমানগণ! তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।' আয়াতে 'ফেৎনা' দ্বারা কুফুরী শক্তি ও কাফেরদের শান-শওকতের ফেৎনা উদ্দেশ্য। আর আয়াতের মধ্যে ويكون الدين-এর দ্বারা সামগ্রিকভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ليظهره على الدين كله অর্থাৎ 'দ্বীন এতটুকু শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাতে কুফুরী শক্তির দ্বারা পরাজিত হওয়ার আশংকা না থাকে এবং দ্বীন ইসলাম যেন সম্পূর্ণরূপে কুফুরী ফেৎনা ও আশংকামুক্ত হয়ে যায়।' [সীরাতে মুস্তাফা: খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮৬]

আর যদি শুধু দাওয়াতের অনুমতি লাভ হওয়ার পরই জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়, তবে আজ তো মুসলমানদেরকে পৃথিবীর অনেক দেশেই তাবলীগের অনুমতি দেয়া হচ্ছে (দুর্ভাগ্যজনক কথা হল কোনো কোনো মুসলিম দেশ এর অনুমতি দিচ্ছে না।) এর দাবী হল এখন আর মুসলমানদের তরবারী উঠানোর প্রয়োজন নেই। গোটা বিশ্বে কাফেরদের জয়-জয়কার ও বিজয় নিশান উড়তে থাকবে এবং তাদের শান-শওকত ও বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তাদের পলিসী চলবে, তাদের বিধিবিধান জারি হবে, তাদের চিন্তাধারা বিকশিত হবে, তাদেরই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। আর মুসলমান এর ওপর তুষ্ট হয়ে বসে থাকবে যে, অমুসলিম দেশে আমাদের ধর্ম প্রচারকগণের প্রবেশ করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা বা বিধি-নিষেধ নেই। প্রশ্ন হল যে, পৃথিবীতে যেখানে কুফুরী শক্তির জয়-জয়কার ও শান-শওকত প্রতিষ্ঠিত, সেখানে তাবলীগের অনুমতি পেলেও কতজন মানুষ তা বুঝে-শুনে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে?

যে পরিবেশে রাষ্ট্রীয় শক্তির আশ্রয়ে ইসলাম ও তার শিক্ষার বিপরীত চিন্তাধারা পূর্ণ উদ্দোমে প্রচার করা হচ্ছে এবং এর প্রচার-প্রসারে ওইসব উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে, যা মুসলমানরা ব্যবহার করতে পারছে না; সেখানে শুধু তাবলীগের অনুমতি পেলে তা অমুসলিমদের মধ্যে কতটুকু প্রতিক্রিয়া হবে?

হ্যাঁ, যদি ইসলাম এবং মুসলমানদের এমন দাপট ও শান-শওকত অর্জিত হয়ে যায়, যার মোকাবেলায় কাফেরদের শক্তি পরাজিত। অথবা ন্যূনতম পক্ষে ওই ফেৎনা যেন সৃষ্টি করতে না পারে, যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। সেই অবস্থায় অমুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তার চুক্তির মাধ্যমে সন্ধি স্থাপন করা জিহাদের বিধানের পরিপন্থি নয়। এমনিভাবে যতক্ষণ না কুফুরী শক্তির শান-শওকত গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য মুসলমানদের প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তি সঞ্চয়ের পাশাপাশি অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে দুই অবস্থায় চুক্তি হতে পারে।

এক. যে সসব রাষ্ট্রের শক্তি ও শান-শওকত দ্বারা মুসলমানদের শক্তি ও শান-শওকতের কোনো আশংকা নেই, তাদের সঙ্গে সন্ধি ও নিরাপত্তার চুক্তি করা যেতে পারে, যতক্ষণ না তারা পুণর্বার মুসলমানদের জন্য হুমকির কারণ হয় ।

দুই. যদি তরবারীর মাধ্যমে মুসলমানদের যুদ্ধের সামর্থ্য না থাকে তাহলে শক্তি অর্জন হওয়া পর্যন্ত অমুসলিমদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যেতে পারে।

আপনি 'আল-বালাগে'র মুহররম ১৩৯১ হিজরী সংখ্যায় প্রকাশিত আমার যে বিষয়বস্তুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এতে ওই চুক্তিগুলোই উদ্দেশ্য। রবিউসসানী ১৩৯১ হিজরী সংখ্যায় প্রকাশিত যে বিষয়বস্তুর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন এতে উদ্দেশ্য হল, যখন কাফেরদের শান-শওকত মুসলমানদের শান-শওকতের চেয়ে প্রবল হবে।

সুতরাং আপনি যে কথা লিখেছেন শত্রু, অকল্যাণকামী এবং অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে সামর্থ থাকলে আক্রমনাত্মক জিহাদ করা ওয়াজিব। যাতে করে তাদের শক্তি শেষ হয়ে যায় এবং ইসলামের দাওয়াতের কাজ কোনোরকম বাধা-বিঘ্নতা ছাড়াই নির্দ্বিধায় করা যায়। আর যেসব অমুসলিম ও মিত্রদেশ তাদের এখানে দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি দেয়, সেখানে আক্রমনাত্মক জিহাদের অনুমতি নেই। যদি এর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য এমনটিই হয়, যা আমি ওপরে বর্ণনা করেছি, তাহলে তো কোনো কথা নেই। আর যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, শুধু তাবলীগের অনুমতি দেয়ার পর একটি অমুসলিম রাষ্ট্র মিত্র হয়ে যায় এবং তাদের সঙ্গে জিহাদ বৈধ নয়, তাহলে আমি বলব এটি ঠিক নয়। যার প্রমাণাদি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

আপনি আরো বলেছেন, 'বিশেষত: বর্তমান যুগে গ্লোবালাইজেশনকে সারাবিশ্বে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।' এর বিপরীত ওই যুগ যখন বিজয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং এ বিজয় ছিল রাজা বাদশাদের শোভা বর্ধনের প্রতীক'। আর ইসলামের ইতিহাসে এ জাতীয় আক্রমনাত্মক জিহাদের ঘটনায় ভরপুর। সেগুলো তো ওই যুগেই ছিল।' সুতরাং আমি আপনার একথার প্রতি শত সম্মান প্রদর্শন করি। তবে আমি এর সঙ্গে কোনোক্রমেই একমত হতে পারছি না। কারণ, যদি এই কথা মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে যে, কোনো জিনিসের ভালমন্দ যাঁচাইয়ের জন্য ইসলামের কোনো মানদণ্ড নেই। যদি কোনো যুগে কোনো মন্দ জিনিসকে ভাল মনে করা হতে থাকে, তাহলে ইসলামও তাকে ভাল মনে করবে। আর যদি কোনো যুগে কোনো ভাল জিনিসকে মন্দ মনে করা হতে থাকে, ইসলামও সেখানে তাই মনে করবে।

প্রশ্ন হল যে, 'আক্রমনাত্মক জিহাদ' প্রকৃত অর্থেই ভাল কি না? যদি ভাল হয়, তাহলে মুসলমানরা শুধু এই শ্লোগানের 'বর্তমান যুগে গ্লোবালাইজেশনকে সারাবিশ্বে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।' ওপর ভিত্তি করে কেন আক্রমনাত্মক জিহাদ থেকে বিরত থাকবে? আর যদি ভাল না হয়ে মন্দ হয়, তাহলে অতীতে ইসলাম তাদেরকে কেন বারণ করেনি? এবং শুধু এই কারণে এর ওপর আমল চলে আসছে যে, 'এটি রাজা বাদশাহদের শোভা বর্ধনের প্রতীক।'

আমার মতে ইসলামের ইতিহাসে আক্রমনাত্মক জিহাদের এই ব্যাখ্যা চরম পর্যায়ের ভুল এবং প্রকৃত সত্যের অপলাপ মাত্র। মূলকথা এটি যে, কাফেরদের শক্তিকে ভুলণ্ঠিত করার জন্য ওই যুগেও জিহাদ করা হয়েছে, যখন এগুলোকে রাজা বাদশাহদের শোভা বর্ধনের প্রতীক মনে করা হত। তবে এই জন্য নয় যে, ওই যুগে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল; বরং আল্লাহর দ্বীনের শান-শওকত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগুলো বাস্তবেই সুবর্ণ সুযোগ ছিল। অন্যথায় 'বাদশাহদের শোভা বর্ধনের প্রতীক' হিসেবে একথাও গণ্য হত যে, তারা বিজয়ের নেশায় মাতাল হয়ে নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেও কোনো পার্থক্য নির্ণয় করত না। কিন্তু ইসলাম অপকর্মের বহুল প্রচলনের ওপর ভিত্তি করে এসব নিন্দনীয় বিষয়ের ওপর আমল পছন্দ করে নাই; বরং ইসলাম এমন এমন যুদ্ধনীতি প্রণয়ন করেছে ও তার ওপর আমল করে দেখিয়েছে যে, বর্তমান যুগের বাদশাহগণ তা কল্পনাও করতে পারে না; বরং ওগুলো ছিল ওইসব নির্যাতিত মানুষের জন্য চমকপ্রদ ও অবিশ্বাস্য। যারা বাদশাহদের নির্যাতন নীরবে সহ্য করে তাদের প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ।

যে উদ্দেশ্যে আক্রমনাত্মক জিহাদ প্রথমে বৈধ ছিল ওই উদ্দেশ্যে বর্তমানেও তা বৈধ। শুধু এর ওপর ভিত্তি করে তার বৈধতাকে আড়াল করা যাবে না যে, এটম বোম, হাইড্রোজন বোম আবিস্কারকারী ও নিরাপত্তার শ্লোগানধারীরা গ্লোবালাই-জেশনের জুজুবুড়ির ভয় দেখিয়ে এর ওপর নাক ছিটকাবে? যাদের গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার আপামর জনসাধারণ এখনো রক্তে রঞ্জিত।

গোস্তাখী মাফ করবেন। আমার মনে হয় এটিও কাফেরদের শান-শওকতেরই অংশবিশেষ যে, ভাল-মন্দের মানদণ্ড বিশ্বব্যাপী এমন অপপ্রচারের ওপর ভিত্তি করে যা মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে প্রচার করে থাকে। তারা এত জোরালোভাবে প্রচার-প্রপাগাণ্ডায় লিপ্ত যে, অমুসলিম তো দুরের কথা খোদ মুসলমানরাই তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বীয় ধর্মীয় বিধিবিধানের ব্যাপারে ভিন্নপথ অবলম্বন করতে উৎসাহী হয়ে থাকে। যদি ভ্রষ্টদের শক্তিকে গুঁড়িয়ে দেয়াও গ্লোবালাইজেশন শ্লোগানের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে এমন গ্লোবালাইজে-শনের আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা সেই আপত্তিকারীদের সামনে এই কথা বলে আর জোর হাত করে বসে থাকব না যে, আপনি যেহেতু আক্রমনাত্মক জিহাদকে ভাল মনে করেন, আমরাও তা ভাল মনে করে এর ওপর আমল করছিলাম। আর যখন থেকে আপনি প্রপাগাণ্ডা এবং গ্রন্থাবলীতে মন্দ বলতে শুরু করেছেন, আমরাও একে নিজের ওপর হারাম করে নিলাম। এই চিন্তাধারার সঙ্গে আমার একমত হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত